পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

‘আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি’

প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)
জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন
প্রফেসর অফ সার্জারী
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক
কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৬

কম্পিউটার কম্পোজ
আম্মার কম্পিউটারস
৩৭/এ দক্ষিণ শাহজাহানপুর
ঢাকা ১২১৭
যোগাযোগ: ০১৯২-৯৭০০৬২

মুদ্রণ ও বাঁধাই
দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১১২৭২
৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ২০.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎস –	৭
	❖ আল-কুরআন	৭
	❖ আল-হাদীস	৮
	❖ বিবেক-বুদ্ধি	৯
৩.	সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে	১৪
৪.	ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ	১৫
৫.	মূল বিষয়	১৬
৬.	পড়ার সুরের শ্রেণী বিভাগ	১৭
৭.	কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য	১৭
৮.	কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্য	১৮
৯.	আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের সকল তথ্যের সারসংক্ষেপ	৩২
১০.	কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য	৩২
১১.	আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত তথ্য	৪৩
১২.	কুরআনকে আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতি চালু হলেযে সকল কল্যাণ হবে	৪৩
১৩.	আল কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া সিদ্ধ হবে কিনা	৪৪
১৪.	শেষ কথা	৪৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের

প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

(বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৪.০১.২০০৪ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০টায় ইনসাফ ডায়াগনস্টিক ও কনসালটেশন সেন্টার, ১২৯ নিউইস্কাটন, ঢাকা, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের মূল উৎস তিনটি– আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি মূল উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি

রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. আল-হাদীস

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের জীবনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা: ৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে কোনটি পাপ কাজ ও কোনটি সৎ কাজ অর্থাৎ কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায়, ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে তা বুঝার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্মগত এই ক্ষমতাকেই বিবেক বলা হয়।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে–

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার

নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

   إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُونَ.

   অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

   وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُونَ.

   অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,
গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং
ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,
খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং
গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের

কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক রকেটে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক রকেটে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা যে সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসের একের অধিক ব্যাখ্যার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে মূল উৎস তিনটির আলোকে অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস বলে। কিয়াসকারীকে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ ও অন্যান্য জ্ঞানে যেমন পারদর্শী হতে হয় তেমনি তার বিবেক-বুদ্ধিও প্রখর ও সমুন্নত থাকতে হয়।

আর কোন বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞের কিয়াসের ফলাফল যদি একই হয়, তবে ঐ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলা হয়। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে। তাই সহজেই বুঝা যায়, কিয়াস ও ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের তথ্যের কোন মূল উৎস নয়।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াসের কোন সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.) ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

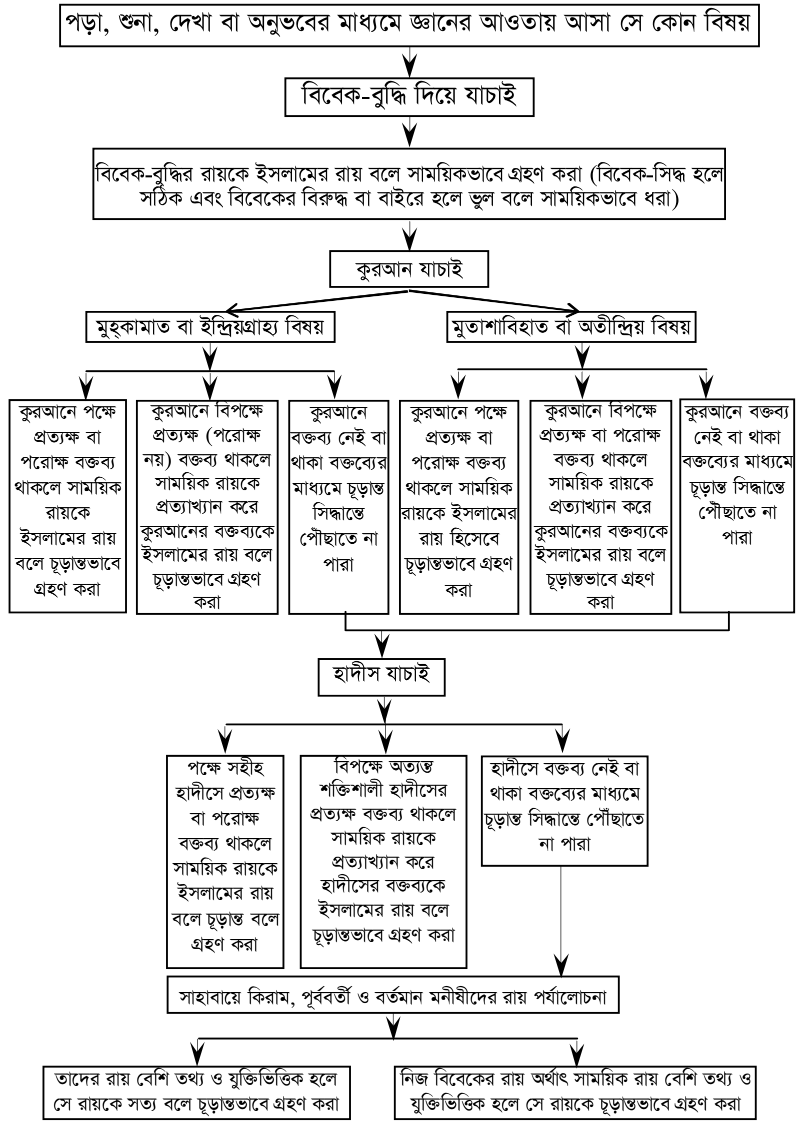

মূল বিষয়

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান কুরআন পড়ে ভাব প্রকাশ ছাড়া সুর করে। এ পদ্ধতিটা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা যেকোনভাবেই হোক জানেন যে- ঐ পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে আল-কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছে। পদ্ধতিটা এমন যে-

- ❑ অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়তে কোন অসুবিধা হয় না,
- ❑ কুরআন পড়ার সময় মনের অবস্থার বা আবেগের যথাযথ পরিবর্তন হয় না।

কুরআন পড়ার এ পদ্ধতির সঙ্গে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী কথাটি ইসলামসম্মত বলে চালু থাকার দরুন অধিকাংশ মুসলমান-

- ❑ অর্থ না জানা সত্ত্বেও কুরআন পড়তে পারছে,
- ❑ বেশি সওয়াব পাওয়ার জন্যে অর্থ ছাড়া কুরআন বারবার খতম দেয়ার চেষ্টা করছে,
- ❑ কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে,
- ❑ কুরআন পড়ার সময় তাদের মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হচ্ছে না।

কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের ১ নং কাজ বা সব চেয়ে বড় সওয়াবের কাজ। আর কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজ বা সকল মুসলমানের জন্যে সব চেয়ে বড় গুনাহের কাজ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি ‘পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ’ নামক বইটিতে। তাই সহজেই বলা যায়, কুরআনের বর্তমান পঠন পদ্ধতি ও অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী কথা দুটো কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলমানদের দূরে রাখতে অর্থাৎ ইবলিস শয়তানকে তার ১ নং কাজে সফল হতে দারুণভাবে সাহায্য করছে।

‘অর্থছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী’ কথাটি কুরআন ও হাদীসে কোথাও নেই। কথাটি হচ্ছে, একটি দুর্বল হাদীসের, কুরআন ও অনেকগুলো শক্তিশালী হাদীস বিরুদ্ধ, অসর্তক ব্যাখ্যা। বিষয়টি আলোচনা করেছি ‘পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?’ নামক বইটিতে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ এবং বিবেক-বুদ্ধি অনুসন্ধান করে দেখা, সেখানে আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কী কী তথ্য আছে। তারপর সে তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করা অধিকাংশ মুসলমান আল-কুরআন যে পদ্ধতিতে পড়ছে, তা সঠিক তথা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যভিত্তিক কিনা।

পড়ার সুরের শ্রেণী বিভাগ

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বুঝা সহজ হবে যদি পড়ার সুরের শ্রেণী বিভাগটি আগে জেনে ও বুঝে নেয়া যায়। পড়ার সুর প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. গানের সুর এবং

খ. আবৃত্তির সুর।

গানের সুর

গানের সুর হচ্ছে সেই ধরনের সুর যেখানে-

১. ভাব প্রকাশ না করে সুর করে পড়া হয়,

২. সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক এবং

৩. অর্থ না বুঝেও সুর দেয়া যায়।

❑ এ ধরনের সুর করেই বর্তমান প্রায় সব মুসলমান আল-কুরআন পড়ে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব মুসলমান গানের সুরে আল-কুরআন পড়ে।

আবৃত্তির সুর

আবৃত্তির সুর হচ্ছে সেই সুই যেখানে–

১. বক্তব্যের ভাবের উপর ভিত্তি করে সুরের ধরনের পরিবর্তন হয়,

২. বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব সুরের গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি এবং

৩. অর্থ না জানা থাকলে এ সুর দেয়া অসম্ভব বা দুরূহ।

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য

তথ্য-১

কোন গ্রন্থে যদি বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী (আদেশ, প্রশ্ন, ধমক, বিনয়, প্রার্থনা ইত্যাদি) বক্তব্য বা বাক্য থাকে, তবে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সর্বসম্মত রায় হচ্ছে ঐ গ্রন্থের পঠন পদ্ধতি হবে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তি করা। আল-কুরআনে আছে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বক্তব্য বা আয়াত। তাই বিবেক-বুদ্ধির সর্বসম্মত রায় হচ্ছে আল-কুরআন পড়তে হবে, আল্লাহ যেখানে যে ভাবের উল্লেখ করেছেন সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে। অর্থাৎ আল-কুরআন আবৃত্তি করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

তথ্য-২

কোন কিছু পড়ার সময় যদি মনের অবস্থার যথাযথ পরিবর্তন হতে হয় অর্থাৎ ঐ বক্তব্যের প্রতি মনের বিশ্বাস বা ভক্তি বৃদ্ধি বা দৃঢ় হতে হয়, তবে বিবেক-বুদ্ধি বলে, পড়ার পদ্ধতিটি ভাব প্রকাশ তথা আবৃত্তি হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ কবি নজরুল ইসলামের যে কোন বিপ্লবী কবিতার পঠন পদ্ধতি বিবেচনা করলেই হয়। ঐ ধরনের কবিতা যদি ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি করা হয়, তবে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কবিতার বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস বাড়ে বা দৃঢ় হয়। আর যদি ঐ কবিতা একই ভঙ্গিতে, সুর করে পড়া হয় তবে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়বে। তাই কুরআন পড়ার সময় যদি ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি করা হয়, তবে কুরআনের বক্তব্যের প্রতি পাঠকের বা শ্রোতার ঈমান বা বিশ্বাস আরো বেড়ে যাবে বা দৃঢ় হবে। আর যদি কুরআনকে ভাব প্রকাশ ছাড়া একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া হয় তবে অনেক শ্রোতা ঘুমিয়ে যাবে। এ অবস্থা যে বাস্তব তা আমার মত আপনারও দেখে থাকবেন আশা করি।

তথ্য-৩

কুরআন প্রবন্ধ বা গল্পের আকারে নাযিল হয়নি। বরং তা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্তব্যের আকারে নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনের পঠন পদ্ধতি বক্তব্যের মত অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে বলার ন্যায় হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্য

তথ্য-১

আল-কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে সর্বসাকুল্যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ তিনটি হচ্ছে-

❑ ইকরা (اِقْرَأْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি قِرَأَة শব্দ থেকে।

❑ উতলু (اُتْلُ)। এ শব্দটির উৎপত্তি তিলাওয়াত (تلاوة) শব্দ থেকে।

❑ রাত্তিল رَتِّلْ। رَتَّلَ শব্দটি থেকে এই رَتِّلْ এবং تَرْتِيْل (তারতীল) শব্দ দুটির উৎপত্তি হয়েছে।

তাহলে কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতি হবে এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ যে পদ্ধতি বুঝিয়েছেন, সেটিই। আল-কুরআনের কোন শব্দ বা বাক্যে আল্লাহ কী বলেছেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার সর্বসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে-

ক. ঐ শব্দ বা বাক্যের আরবী ভাষায় যদি একটিমাত্র অর্থ হয়, তবে সেটিই হবে ঐ শব্দ বা বাক্য দ্বারা আল্লাহর বলা বক্তব্য।

খ. ঐ শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ হলে-

i. শব্দ বা বাক্যটির পূর্বাপর আলোচনা এবং কুরআনের অন্য যে সকল জায়গায় একই বিষয়ে আলোচনা আছে তা পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, আল্লাহ কুরআনের এক জায়গায় কোন একটি বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য জায়গায় তা বিস্তারিতভাবে বা এক জায়গায় বিষয়বস্তুর একদিক এবং অন্য জায়গায় তার অন্যদিক উপস্থাপন করেছেন। তবে এই পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি যেন কোন এক স্থানের অর্থের বা বক্তব্যের বিরুদ্ধ না হয়। কারণ, আল্লাহ নিজেই বলেছেন (নিসাঃ ৮২) এই কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা নেই।

ii. যদি কুরআনের তথ্যের দ্বারা ঐ শব্দ বা বক্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা না যায় তবে ঐ শব্দ বা বাক্যের ব্যাপারে যতগুলো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তার সবগুলোকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

iii. যদি উপরোক্তভাবে পর্যালোচনা করেও কুরআনের কোন শব্দ বা বাক্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছা যায় তবে কুরআন ও সুন্নাহের অন্যান্য বক্তব্যের আলোকে মানুষের বিবেক-খাটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং এ ব্যাপারে পরবর্তীদের সিদ্ধান্তকে পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, রাসূল (স.) নিজেই বলেছেন (১০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের তুলনায় বেশি জ্ঞানী হবে।

তাই চলুন প্রথমে দেখা যাক, ঐ তিনটি আরবী শব্দের কী কী অর্থ হয়। Milton Cowan-এর সম্পাদিত 'মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ' (A Dictionary of Modern Written Arabic) হচ্ছে আরবী ভাষায় একটি অত্যন্ত বিখ্যাত অভিধান। সেই অভিধানে ঐ তিনটি শব্দের উল্লিখিত অর্থ হচ্ছে-

কিরা'আত (قِرَاءَة)

- ❑ to declaim– বক্তৃতা বা আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা।
- ❑ to read– পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
- ❑ to peruse– মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষা দেয়া।
- ❑ to study– অধ্যয়ন করা, বিচার-বিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, উদ্ভাবন করা, কাম্য বস্তুর জন্যে মনোযোগসহকারে সাধনা করা, ধ্যান করা, চিন্ত-ভাবনা করা।
- ❑ to search– সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্নতন্ন করে খোঁজা।

তাহলে আরবী ভাষাগত দিক দিয়ে কিরা'আত (قِرَاءَة) শব্দ থেকে কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে অর্থ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, বুঝে বুঝে মনোযোগসহকারে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা। আর ভাষাগত দিক দিয়ে এ শব্দটির যে অর্থটা কোন মতেই হয় না তা হচ্ছে-একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া। মহান আল্লাহ কুরআনকে কিরা'আত করার নির্দেশ দিয়েছেন সূরা মুয্‌যাম্মিলের ২০ নং, আলাকের ১ নং, কিয়ামাহের ৯৮ নং এবং ইসরার ১০৬ নং আয়াতে।

তিলাওয়াত (تِلَاوَة)

- ❑ to read– অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ❑ to read out loud– উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা।
- ❑ to recite– আবৃত্তি করা।
- ❑ to follow– অনুসরণ করা, মেনে চলা, বুঝতে পারা।
- ❑ to ensue– অনুসরণ করা।
- ❑ to Succeed– উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা।

তাহলে আরবী ভাষাগত দিক থেকে তিলাওয়াত (تِلَاوَة) শব্দের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে অর্থ হয় তা হচ্ছে, বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা। আর ভাষাগত দিক থেকে এ শব্দটির যে অর্থ কোনভাবেই হয় না তা হচ্ছে, একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

রাতালা (رَتَّلَ)

- ❑ tidy– সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথ সাজানো।
- ❑ neat– সুরুচিসম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, ফিটফাট, ছিমছাম।
- ❑ well ordered– সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুলভাবে পরিচালিত।
- ❑ to be reguler– নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া।
- ❑ to praise elegantly– পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ বা চমৎকারভাবে প্রশংসা করা।
- ❑ Singsong recitatio– সুর করে আবৃত্তি করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আরবী ভাষাগত দিক থেকে রাতালা (رتل) শব্দের পঠন পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবপর অর্থ হচ্ছে, যথাযথভাবে বা নিয়মানুগভাবে সুর করে আবৃত্তি করা। অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া।

رَتَّلَ শব্দটি থেকে তারতিল (تَرْتِيْلَ) শব্দটির উৎপত্তি। এ শব্দটি কুরআনে এসেছে সূরা ফুরকানের ৩২ নং এবং সূরা মুয্যাম্মিলের ৮ নং আয়াতে।

❑❑ সুধী পাঠক, তাহলে দেখা যাচ্ছে আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী হবে, তা জানানোর জন্যে মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন, আরবী ভাষাগত দিক থেকে তার যে সব অর্থ হয় তা হচ্ছে-

ক. আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে কথা বলার ঢঙে পড়া।

খ. সাধারণভাবে আবৃত্তি করে পড়া, অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাব প্রকাশ করে পড়া।

গ. যথাযথভাবে ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া। আর ঐ তিনটি শব্দের আরবী ভাষাগত দিক থেকে যে অর্থ কখনই হয় না তা হচ্ছে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া অর্থাৎ গানের সুরে পড়া।

তথ্য-২

সূরা বাকারায় ১২১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

اَلَّذِيْنَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ط اُوْلٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ط

অর্থ: যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, (তাদের মধ্য থেকে যারা) ঐ কিতাবকে হক আদায় করে তিলাওয়াত করে (পড়ে), তারাই ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন দেয়া হয়েছে মুসলমানদের। তাহলে এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুসলমানদের মধ্যে যারা হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারাই শুধু কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। সুতরাং এ আয়াত থেকে বলা যেতে পারে, যারা হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না তারা কুরআনে বিশ্বাসই করে না। কিন্তু আল-কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন, তাঁর নির্দেশিত কোনো কাজ সমান গুরুত্বের ওজনের কারণে করলে গুনাহ হবে না। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি থেকে যে কথাটি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় তা হচ্ছে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। কী সাংঘাতিক কথা, তাই না? তাই হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত বলতে কী বুঝায় বা তিলাওয়াতের হক কী তা সকল মুসলমানের ভাল করে জানা ও বুঝা দরকার।

হক অর্থ দাবি বা পাওনা। তাই কোন গ্রন্থ পড়ার হক হচ্ছে সেই বিষয়গুলো যা ঐ গ্রন্থ তার পাঠকের নিকট দাবি করে। এ বিষয়ে পৃথিবীর কারোরই দ্বিমত করার কথা নয় যে, কোন ব্যবহারিক গ্রন্থ তার পাঠকের নিকট যে দাবিগুলো করে তার প্রধান ৪টি হচ্ছে-

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া,
২. অর্থ বুঝা বা তার জ্ঞান অর্জন করা,
৩. গ্রন্থের বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা, অর্থাৎ তার আমল করা এবং
৪. অন্য মানুষের নিকট সে জ্ঞান পৌঁছে দেয়া, অর্থাৎ তার দাওয়াত দেয়া।

তাহলে পৃথিবীর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক (Applied) গ্রন্থ আল-কুরআন তার পাঠকের নিকট যে দাবিগুলো করে তারও প্রধান ৪টি হবে-

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া,
২. অর্থ বুঝা অর্থাৎ পড়ার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা,
৩. কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা এবং
৪. দাওয়াতের মাধ্যমে অন্য মানুষের নিকট কুরআনের জ্ঞান পৌঁছে দেয়া।

পড়ার এই হকগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে–প্রথমটি সঠিক না হলে দ্বিতীয়টি সঠিক হবে না। আর দ্বিতীয়টি আদায় না হলে তৃতীয় ও চতুর্থটি আদায় করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিরা কুরআনকে বিশ্বাস করেন না, যারা কুরআন পড়ার সময়-

১. ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পঠন পদ্ধতিতে পড়েন,
২. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়েন,
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে পঠিত বিষয় বা অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন না এবং
৪. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্জিত জ্ঞান অন্যের নিকট পৌঁছান না।

বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কুরআনের পঠন পদ্ধতি। তাই উল্লিখিত চারটি হকের মধ্যে আমরা শুধু 'সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া' নামক হকটি নিয়ে আলোচনা করব। সঠিক পদ্ধতিতে পড়া দরকার এ জন্যে যে, তা না হলে যিনি পড়বেন বা যারা শুনবেন-

- ❑ তিনি বা তারা সঠিক অর্থ বুঝবেন না,
- ❑ তাদের মনে সঠিক ভাবের উদয় হবে না এবং
- ❑ তাদের মনে পঠিত বিষয়টির ব্যাপারে বিশ্বাস দৃঢ় হবে না বা বৃদ্ধি পাবে না।

পড়ার মাধ্যমে সঠিক অর্থ বুঝতে হলে বা মনে সঠিক ভাবের উদয় হতে হলে নিম্নের শর্তগুলো যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা পৃথিবীর কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না-

১. সঠিক উচ্চারণ করে পড়া,
২. সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তি করা,
৩. সঠিক স্থানে বিরতি দেয়া বা থামা এবং
৪. সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেয়া। এ বিষয়টি আরবী ভাষার জন্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

চলুন এখন এই চারটি বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। কারণ, তা পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক উচ্চারণ করে পড়া

এটা দরকার হয় এ জন্যে যে, উচ্চারণ সঠিক না হলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেমন: قُلْ - বল, كُلْ -খাও।

সঠিক ভাব প্রকাশ করা বা আবৃত্তি করা

সঠিক ভাব প্রকাশ করে না পড়ার প্রধান দুটো কুফল হচ্ছে-

ক. সঠিক অর্থ প্রকাশ না পাওয়া বা ভুল অর্থ প্রকাশ পাওয়া

কোন গ্রন্থে যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, পড়ার সময় সেখানে সে ভাব প্রকাশ না করলে অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন-

১. 'আপনি যাবেন না'

এই বাক্যটি যদি ভাব প্রকাশ করে না পড়া হয়, তবে তার অর্থ হবে কাউকে যেতে নিষেধ করা। আর যদি ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবে কাউকে যাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলা। অর্থাৎ সঠিক ভাব প্রকাশ না করলে সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ প্রকাশ পায়।

২.

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا.

অর্থঃ বল আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রব তলব করব? (আন-আম:১৬৪)

এই আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয় তবে তার অর্থ দাঁড়াবে কারো নিকট জানাতে চাওয়া যে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য রব তালাশ করবে কি না। আর সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়লে তার অর্থ দাঁড়াবে আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন রব কখনই তালাশ করব না। তাহলে সঠিক ভাব প্রকাশ না করলে অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায়।

৩.

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ.

অর্থঃ আল্লাহ্ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (ত্বীন:৮)

এ আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে জানতে চাওয়া কে সব থেকে বড় বিচারক, আল্লাহ্ না

অন্য কেউ। আর যদি আয়াতটি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যে, আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তাহলে সহজেই বুঝা যায়, অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন রোধের জন্যে সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪.

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

অর্থঃ আমাকে সরল-সঠিক পথ দেখাও! (ফাতেহা:৫)

এ আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহর নিকট একটি প্রার্থনা। তাই আয়াতটি কোমল, বিনয় ও প্রার্থনার সুরে পড়তে হবে। কেউ যদি আয়াতটি আদেশের সুরে পড়ে তবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহকে আদেশ করা তাকে সঠিক পথ দেখাতে। এটা গুনাহের কাজ হবে। তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে সঠিক ভাব প্রকাশ করে না পড়া গুনাহের কারণ হবে।

৫.

قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অর্থঃ (ফেরেশতারা) বলবে প্রবেশ কর জাহান্নামে। চিরকালই তোমাদের এখানে থাকতে হবে। অহংকারকারীদের জন্যে এটা খুবই খারাপ জায়গা। (যুমার:৭২)

আয়াতটিতে কাফেররা দোযখের গেটে পৌঁছালে গেটের পাহারাদার ফেরেশতারা শেষ পর্যায়ে যে কথাগুলো বলবে তা বলা হয়েছে। ফেরেশতারা কাফেরদের দোযখে ঢুকে যেতে এবং সেখানে চিরকাল থাকার কথা বলবে। পরকালে কাফেরদের সঙ্গে সব সময় কঠোর ব্যবহার করা হবে। কোন সময় কোমল ব্যবহার করা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতাদের কথাগুলো হবে আদেশ ও ধমকের সুরে। সুতরাং আয়াতটি তেলাওয়াত করার সময় আদেশ ও ধমকের ভাব প্রকাশ না করে কোমল ও বিনয়ের ভাব প্রকাশ করলে পরকালের অবস্থার ভুল প্রকাশ হবে। এটি অবশ্যই সঠিক হবে না।

খ. সঠিক ভাবের উদয় হওয়া ও বিশ্বাস বেড়ে যাওয়া বা দৃঢ় হওয়া-

কোন বাক্য পড়ে মনে তার সঠিক ভাবের উদয় হতে হলে বা ঐ বাক্যের উপর বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে হলে, বাক্যটিকে ভাবপ্রকাশ করে

পড়া গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লবী কবিতা ভাব প্রকাশ করে পড়া না পড়ার বিষয়টি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সঠিক স্থানে বিরতি দেয়া বা থামা

সঠিক স্থানে বিরতি না দিলে বা না থামলেও অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই পড়ার সময় সঠিক স্থানে বিরতি দেয়া দরকার। এটা সকল ভাষার জন্যেই প্রযোজ্য।

সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেয়া

এটা আরবী ভাষার বেলায় প্রযোজ্য। এই টান দেয়ার প্রয়োজনও এ জন্যে যে, তা না হলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়।

সুধী পাঠক,

আলোচ্য আয়াতের (বাকারা : **১২১**) দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে এ কথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে, আল-কুরআন পড়ার সময় যারা পঠন পদ্ধতি সঠিক হওয়ার জন্যে আলোচনাকৃত চারটি শর্তের একটিও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ করে না তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তারা অবশ্যই বড় গুনাহগার হবেন। অবশ্য যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা চেষ্টা সত্ত্বেও পঠন পদ্ধতি সঠিক হওয়ার এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করতে পারেন না, তাদের কথা ভিন্ন। যেমন ধরুন, যে সকল অনারব মুসলমান বেশি বয়সে কুরআন পড়া শিখেছেন, তাদের পক্ষে সঠিক উচ্চারণ করে কুরআন পড়া অত্যন্ত কঠিক বা অসম্ভব। তাই চেষ্টা সত্ত্বেও তারা যদি সঠিক উচ্চারণে কুরআন না পড়তে পারেন, তবে তার জন্যে মহান আল্লাহ তাদের ধরবেন না বরং তাদের ঐ প্রচেষ্টার জন্যে সওয়াব বেশি দিবেন বলে কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায়।

আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে বর্তমান মুসলমান জাতির অবস্থা হচ্ছে, পঠন পদ্ধতির যে সব শর্ত (উচ্চারণ, বিরতি ও টান) সঠিক হলে শুধু সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়ার জন্যে মনের ভাবের পরিবর্তন হয়, সে সব বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করা যে গুনাহের কাজ, তা তারা সবাই স্বীকার করেন এবং সে অনুযায়ী সবাই আমল করেন বা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পঠন পদ্ধতির যে শর্তটি (ভাব প্রকাশ করা বা আবৃত্তি করা)

পূরণ করলে সঠিক অর্থ প্রকাশিত হওয়াসহ পড়ার ভঙ্গিটার জন্যেও সরাসরিভাবে মনের ভাবের পরিবর্তন হয়, সে শর্তটা ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করাকে বর্তমান বিশ্বের প্রায় মুসলমান, গুনাহের কাজ মনে করাতো দূরের কথা সওয়াবের কাজ মনে করেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করেন। কুরআনের আয়াতের এবং সাধারণ বিবেক বুদ্ধির কী চরম অবহেলা, তাই না? বিষয়টা যদি দু'চারজন মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তা হলেও সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু বিষয়টা প্রায় সকল মুসলমানের মধ্যে বিরাজমান।

তথ্য-৩

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً.

অর্থ: কুরআনকে রতল কর তারতীল সহকারে। (মুয্যাম্মিল : ৪)

ব্যাখ্যা: রতল এবং তারতীল শব্দের পূর্বে আলোচনাকৃত আরবী ভাষাগত অর্থ অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কুরআনকে আবৃত্তির সুরে নির্ভুলভাবে বা যথাযথভাবে পড়। আর ভাষাগত দিক থেকে এ আয়াতটির অর্থ 'কুরআনকে নির্ভুলভাবে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ো' কখনই হতে পারে না। কারণ, তা হলে-

ক. রতল শব্দের ভুল অর্থ ধরা হবে।

খ. ২ নং তথ্যের আয়াতটির বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

তথ্য-৪

وَاتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ.

অর্থ: তিলাওয়াত করো তোমার রবের কিতাব থেকে যা তোমার নিকট অহী করা হয়েছে। (কাহাফ : ২৭)

ব্যাখ্যা: তিলাওয়াত শব্দের পূর্বে আলোচনাকৃত আরবী ভাষাগত অর্থ অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ হবে, আবৃত্তি করো তথা ভাব প্রকাশ করে পড়ো তোমার রবের কিতাব থেকে, যা তোমার নিকট ওহী করা হয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে এ আয়াতেরও অর্থ কখনও এটা হবে না যে, একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ো তোমার রবের কিতাব থেকে যা তোমার নিকট ওহী করা হয়েছে। তাহলে এ আয়াতেরও আরবী ভাষাগত অর্থ এবং ২ নং তথ্যের আয়াতটির ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা তথ্য হুবহু মিলে যায়।

আল-কুরআনে তিলাওয়াত শব্দটি ৬৩ বার ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ বার তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তথ্য-৫

فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

অর্থ: অতএব (নামাযে) কুরআন থেকে কিরা'আত করো যতটা তোমার পক্ষে সহজ হয়। (মুয্যাম্মিল : ২০)

ব্যাখ্যা: পূর্বে আলোচনাকৃত কিরা'আত শব্দের আরবী ভাষাগত অর্থ অনুযায়ী এর অর্থ হয়, অতএব (নামাযে) কুরআনকে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করো, যতটা তোমার পক্ষে সহজ হয়। আর কিরা'আত শব্দের ভাষাগত অর্থ অনুযায়ী এ আয়াতের যে অর্থটি কোনোভাবেই হয় না, তা হচ্ছে- অতএব (নামাযে) কুরআন একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ো যতটা তোমার পক্ষে সহজ হয়। এ আয়াতের ভাষাগত অর্থের সঙ্গেও তাই দুই নং তথ্যের আয়াতটির ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা তথ্যের সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়।

তথ্য-৬

لاَتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَاِذَاقَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَابَيَانَه.

অর্থ: (হে নবী কুরআনকে) তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়ার জন্যে নিজের জিহ্বাকে ঘন ঘন নাড়াবেন না। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। তাই আমি যখন (কুরআন) পড়তে থাকি, তখন আমার পঠন পদ্ধতিটার দিকে মনোযোগ দিন। পরে ওর সঠিক বা বিস্তারিত তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্বে রয়েছে। (কিয়ামাহ:১৬-১৯)

ব্যাখ্যা: কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে রাসূল (স.), স্বাভাবিক মানবীয় কারণে, দুটো জিনিস করতেন-

১. ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর নিকট থেকে কোন আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে, মুখস্থ করে নেয়ার জন্যে বারবার নিজ জিহ্বাকে নাড়িয়ে তা পড়তেন,

২. যে শব্দটি তিনি নতুন শুনতেন, তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতেন।

রাসূল (স.)-এর এই প্রবণতার প্রেক্ষিতে জিব্রাইল (আ.) এখানে তাঁকে বলেছেন, 'কুরআনের কোন আয়াত আমার নিকট থেকে শুনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়া বা তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে নেয়ার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। কারণ, কুরআনের আয়াতকে

মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং তার সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সে দায়িত্ব আমি যথাসময়ে পালন করব। তাই আমি যখন কুরআন পড়ি তখন মনোযোগসহকারে আমার পঠন পদ্ধতির দিকে খেয়াল করবেন এবং তা মনে রাখবেন (কারণ, পঠন পদ্ধতি সঠিক না হলে সেই পড়া দ্বারা সঠিক অর্থের প্রকাশ পাবে না এবং মনের ভাবেরও সঠিক বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হবে না')। জিব্রাইল (আ.) যে পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন পড়তেন, সেটা অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশিত ছিল। তাই জিব্রাইল (আ.)-এর পঠন পদ্ধতি কী ছিল সেটা জানতে পারলে তা হবে কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আর এ তথ্যটি কুরআন বা সুন্নাহে থাকবে না তা হতে পারে না। কারণ, মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমেই জানিয়ে দিয়েছেন আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি (মায়িদাহ : ০৩) এবং আমি এই কুরআনে ইসলামের সকল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয় বর্ণনা করেছি। (নাহল : ৮৯)

জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী ছিল তা কুরআনে সরাসরিভাবে উল্লেখ নেই। তবে হাদীস শরীফে সে ব্যাপারে সরাসরি তথ্য আছে যা পরে আসছে। সে হাদীসে জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে কুরআনে উল্লিখিত শব্দ তিনটির (কিরা'আত, তিলাওয়াত এবং রতল) থেকে ভিন্নতর। কিন্তু সে শব্দটিরও আরবী ভাষাগত অর্থ হচ্ছে আবৃত্তি করা অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে পড়া। তাহলে এ আয়াতের বক্তব্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে হাদীসের সাহায্য নিলে কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে তথ্য বের হয়ে আসে, সেটাও হচ্ছে আবৃত্তি করা বা ভাব প্রকাশ করে পড়া।

তথ্য-৭

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا.

অর্থ: আর তাঁর (আল্লাহর) আয়াত যখন তাদের (মুমিনদের) সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (আনফাল:২)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, প্রকৃত মু'মিনদের সামনে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলে সে তিলাওয়াত শুনে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। অর্থাৎ কুরআনের প্রতি বা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস বেড়ে যায়। কোন গ্রন্থের পড়া শুনে যদি শ্রবণকারীর ঈমান বেড়ে যায়, তবে ঐ গ্রন্থ পড়লে পাঠকারীর ঈমানও অবশ্যই বাড়বে। পড়ার মাধ্যমে পঠিত বিষয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস বাড়ে যদি পঠিত বিষয়টি মনের মধ্যে বুঝের এবং ভাবের (আবেগের) পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বুঝের পরিবর্তন হতে হলে পঠিত বিষয়টির অর্থ অবশ্যই বুঝতে হবে। আর বুঝলে মনের মধ্যে ভাবের বা আবেগের পরিবর্তন অবশ্যই হয়, তবে সেই পরিবর্তন বেশি হয় যদি পড়াটা হয় বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে পড়া।
তাই এই আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও পরোক্ষভাবে বলা যায়, কুরআন পড়ার পদ্ধতি হওয়া উচিত বুঝে বুঝে ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তি করা।

তথ্য-৮

আল-কুরআন অনুযায়ী শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে রাখা এবং মু'মিনের ১ নং কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

ইসলামের করণীয় কোনো কাজকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে শয়তানের বেশি পছন্দনীয় পদ্ধতি, ওই কাজ করতে নিষেধ করা নয় বরং তা হচ্ছে ঐ কাজ এমনভাবে করতে উৎসাহ দেয়া যাতে যে ব্যক্তি কাজটির করছে সে খুশি থাকে কিন্তু কাজটির উদ্দেশ্য সাধিত না হয়। কারণ, উদ্দেশ্য সাধন না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, কাজটি ব্যর্থ হওয়া। তাই ইবলিস শয়তান তার ১ নং কাজে সফল হওয়ার জন্যে এই পদ্ধতি বেশি প্রয়োগ করবে, সেটা স্বাভাবিক।

কুরআন পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং পরে সে অনুযায়ী আমল করা। কোনো কিছু পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা অর্থসহ বা অর্থ বুঝে পড়তে হবে। তাই কুরআন পড়া কাজটি ইবলিস শয়তান এমনভাবে করতে বলবে বা করতে উৎসাহ দিবে যাতে–

- ❑ অর্থ না বুঝা হয়,
- ❑ অর্থ না বুঝেও পড়া সম্ভব হয়,
- ❑ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এমনভাবে পড়া হয়,
- ❑ পড়ার পর মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন না হয়।

আর ঐ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ বা বক্তব্য এমন হবে যাতে-

- ❑ অর্থ বুঝা হয়,
- ❑ অর্থ না বুঝে পড়া সম্ভব না হয়,

- ❑ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এমনভাবে পড়া না হয়,
- ❑ পড়ার সময় মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হয়।

কুরআনকে ভাব প্রকাশ না করে একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়ার পদ্ধতিটা-

- ❑ অর্থ না বুঝেও অনুসরণ করা যায়,
- ❑ কুরআনের আয়াতের অর্থের পরিবর্তন করে দেয়,
- ❑ মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হতে দেয় না।

তাই এটা আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতি না হয়ে শয়তানের পছন্দয়ীয় পদ্ধতি হওয়াই স্বাভাবিক।

আল কুরআনকে ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ আবৃত্তি করে পড়ার পদ্ধতিটা-

- ❑ অর্থ না জানলে অনুসরণ করা সম্ভব নয় বা দুরূহ,
- ❑ কুরআনের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে,
- ❑ মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হতে সহায়তা করে।

তাই এটা আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতি হওয়া এবং শয়তানের পছন্দনীয় পদ্ধতি না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তথ্য-৯

আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়,আল কুরআন তথা ইসলামে অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় ছাড়া চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেকের বাইরের বা বিবেক বিরুদ্ধ কোন কথা নেই। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেকের বাইরের বা বিবেক বিরুদ্ধ কোন কথা কুরআন-সিদ্ধ তথা ইসলাম সিদ্ধ কথা নয়।

পঠন পদ্ধতি কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় নয়। এটি একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাই এ বিষয়ে চিরন্তনভাবে বিবেকের বাইরের বা বিবেক বিরুদ্ধ কোন কথা কুরআন-সিদ্ধ তথা ইসলাম–সিদ্ধ কথা হবে না।

পূর্বেই (বিবেক-বুদ্ধির তথ্য অধ্যায়ে) আলোচনা করা হয়েছে আল-কুরআনের ন্যায় একটা ব্যবহারিক কিতাব, যেখান আছে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বক্তব্য বা আয়াত, তা ভাব প্রকাশ না করে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া সম্পূর্ণ বিবেক-বিরুদ্ধ। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, কুরআনকে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া অর্থাৎ গানের সুরে পড়া পরোক্ষভাবে কুরআন বিরুদ্ধ এবং ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তির সুরে পড়া পরোক্ষভাবে কুরআন সিদ্ধ।

আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের সকল তথ্যের সারসংক্ষেপ

এ পর্যায়ে এসে তাহলে কুরআন পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে আল-কুরআনের ভাষাগত ও বর্ণনাগত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলো নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় তা হচ্ছে-

- ❑ আল-কুরআন পড়তে হবে যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে,
- ❑ কুরআনকে একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার পদ্ধতি অর্থাৎ গানের সুরে পড়ার পদ্ধতি, কুরআন বিরুদ্ধ পদ্ধতি।

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য

পূর্বেই আমরা দেখেছি, আল-কুরআন পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে কুরআনে ভাষাগত, বর্ণনাগত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক তথ্য আছে। তাই সুন্নাহ বা হাদীসেও এ ব্যাপারে তথ্য থাকতেই হবে। কারণ, আল-কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ গঠনের ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর প্রথম ও দ্বিতীয় কাজই ছিল যথাক্রমে কুরআন পড়ে শোনানো এবং কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের জীবনকে ঢেলে সাজানো। তবে এ ব্যাপারে হাদীসের তথ্য পর্যালোচনার সময় যে বিষয়গুলোর বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে-

১. হাদীসের কোন তথ্য বা তার ব্যাখ্যা কুরআনে একই ব্যাপারে উল্লেখিত কোন স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত হতে পারবে না,

২. এ বিষয়ে যতগুলো হাদীস আছে তার সবগুলো পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

চলুন এখন আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে হাদীসের তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা যাক-

তথ্য-১

ক.

عَنْ اِبْنِ عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاس بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْآنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.بخارى و مسلم

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, দানের ব্যাপারে রাসূল (স.) ছিলেন সর্বাপেক্ষা দারাজদিল। আর তাঁর এই দারজদিলি রমযানে সর্বপেক্ষা বেড়ে যেত। রমযানের প্রত্যেক রাতেই জিব্রাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল (স.) তাঁকে কুরআন, 'আরজ' (عرض) করে শুনাতেন। যখন তাঁর সঙ্গে জিব্রাইল (আ.) সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁর দান, বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত। (বুখারী ও মুসলিম)

খ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيه.(رواه البخارى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.)-এর নিকট প্রত্যেক বছর (রমযানে) কুরআন একবার 'আরজ' (عرض) করা হত। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর 'আরজ (عرض) করা হল দু'বার। তিনি প্রত্যেক বছর এ'তেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু এন্তেকালের বছর এ'তেকাফ করেন ২০ দিন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: পূর্বে উল্লিখিত কুরআনের ৬ নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি, জিব্রাইল (আ.) যখন রাসূল (স.) কে কুরআন শুনাতেন, তখন তাঁর পঠন পদ্ধতিটার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে রাসূল (স.)কে তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু জিব্রাইল (আ.) কী পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন পড়তেন তা বর্ণনা আকারে কুরআনে নেই। তাই এই হাদীস দু'খানি হচ্ছে কুরআনের ঐ বক্তব্যের ব্যাখ্যা। হাদীস দু'খানির জিব্রাইল (আ.)-এর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতি জানাতে বা বুঝাতে যে শব্দটি রাসূল (সা.) হাদীস দু'খানিতে ব্যবহার করেছেন, তা পঠন পদ্ধতি জানানো বা বুঝানোর জন্যে আল-কুরআনে উল্লিখিত শব্দগুলো (কিরা'আত, তিলাওয়াত, রতল) থেকে ভিন্নতর। তাই হাদীস দু'খানিতে উল্লিখিত শব্দটির (عرض) আরবী ভাষাগত অর্থটা পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বোল্লিখিত Milton Cowan–এর অভিধানে (Dictionary) এই 'আরজ' (عرض) শব্দের যে অর্থগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে –

- ❑ Presentation– উপস্থাপন করা, পেশ করা, কাউকে দিয়ে অভিনয় করানো,
- ❑ Demonstration–আবেগ অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করে এমনভাবে উপস্থাপন করা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ্য অভিব্যক্তিসম্বলিত উপস্থাপনা, আবেগোচ্ছ্বাস উপস্থাপনা, সোচ্চার উপস্থাপনা,
- ❑ Staging– নাটক মঞ্চায়ন করার রীতি,
- ❑ Showing– প্রদর্শন করা, ফুটিয়ে তোলা,
- ❑ Performance– মঞ্চাভিনয়,
- ❑ Display– প্রদর্শন করা,
- ❑ Exposition– ব্যাখ্যাকরণ,
- ❑ Exhibition– প্রদর্শনী।

সুতরাং কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে এই হাদীস দুটোর তথ্য আর ঐ বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের তথ্য একই। তাই কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে এই হাদীস দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ, কোন হাদীসের তথ্যের সঙ্গে কুরআনের বক্তব্যের মিল থাকলে সে হাদীস অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীস হয়ে যায়। এ বিষয়ে অন্য কোন হাদীস তাই এ দুটো হাদীস থেকে কোনভাবেই বেশি শক্তিশালী হতে পারে না। তা হতে হলে সেই হাদীসকে কুরআনের আয়াত থেকে শক্তিশালী হতে হবে, যেটা অসম্ভব।

তথ্য-২

ক.

وَعَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَانْتَهَى إِلَى (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ

قَرَأَ (وَالْمُرْسَلَاتِ) فَبَلَغَ (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ.

(رواه ابوداؤد و الترمذى الى قوله انا على ذالك من الشاهدين)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে কেউ সূরা ‘ওয়াত্তীন ওয়ায্যায়তুন’ পড়ে এবং এই পর্যন্ত পৌঁছে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ ‘আল্লাহ কি আহ্কামুল হাকেমীন নন?’ তখন সে যেন বলে, بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰالِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ‘নিশ্চয়ই আমিও এর সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি’ এবং যখন সে ‘লা উক্ছিমু বি ইয়াওমিল কিয়ামাহ’ পড়ে আর এ পর্যন্ত পৌঁছে اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ‘তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?’ তখন সে যেন বলে بَلٰى নিশ্চয়। আর যখন সে সূরা মুরছালাত পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ তখন সে যেন বলে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম’। (আবু দাউদ ও তিরমিজী)

খ.

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. رواه ترمذى وابوداؤد والدارمى و روى النسائى وابن مجاة الى قوله الأعلى و قال الترمذى هاذا حديث حسن صحيح.

অর্থ: হযরত হুজাইফাহ (রা.) বলেন, তিনি রাসূল (রা.)-এর সহিত নামাজ পড়েছেন। রাসূল (সা.) রুকুতে ‘ছুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ এবং ছিজদায় ‘ছুবহানা রাব্বিয়াল আ‘লা’ বলতেন এবং যখনই তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোন আয়াতে পৌঁছতেন তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে ‘রহমত’ প্রার্থনা করতেন। এ রূপে যখনই তিনি কোনো আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন তখনই পড়া বন্ধ করে আযাব হতে পানাহ্ চাইতেন। (তিরমিজী, আবু দাউদ ও দারেমী, নাছায়ী। ইবনু মাজাহ ইহা ‘ছুবহানা রাব্বিয়াল আ‘লা’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজী এই হাদীসকে হাছান ছহীহ বলেছেন)

গ.

عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهم قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قَالُوا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. رواه الترمذى و قال هذا حديث غريب.

অর্থ: হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন: একদিন রাসূল (সা.) তাঁর ছাহাবীদের নিকট পৌঁছলেন এবং তাঁদের নিকট সূরা ‘আর রাহমান’ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীগণ শুনে চুপ রইলেন। তখন হুজুর বললেন, আমি এটা ‘লাইলাতুল জিন্নে’ (জিনের রাত্রে) জিনদের নিকট পড়েছি। জিনরা তোমাদের অপেক্ষা এর ভাল উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই ‘তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার?’ পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই তারা বলে উঠেছে: لَابِشَيْئٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ প্রভু হে! আমরা তোমার কোনো নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। (তিরমিজী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে গরিব বলেছেন)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস তিনটির দুটো কাওলি এবং একটি ফেয়লি হাদীস। কাওলি হাদীস হচ্ছে সেই হাদীস যেখানে রাসূল (সা.) কোন কাজ কিভাবে করতে হবে তা মুখে বলেছেন। আর ফেয়লি হাদীস হল সেই হাদীস, যেখানে রাসূল (সা.) কোন কাজ কিভাবে করতে হবে তা বাস্তবে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ তিনটি হাদীস এবং এরকম আরো কিছু হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি আয়াত পড়ার পর তার যে ধরনের উত্তর রাসূল (সা.) সাহাবীদের দিতে বলেছেন বা ঐ আয়াত পড়ার পর, উত্তর দেয়ার জন্যে নিজে বাস্তবে যা বলেছেন, সেই ধরনের উত্তর ঐ আয়াতের শুধু তখনই হয় যখন ঐ আয়াতকে সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া হয়। অর্থাৎ আবৃত্তি করা হয় বা আবৃত্তির সুরে পড়া হয়।

সুধী পাঠক, এ তিনটি হাদীস থেকেও তাহলে বুঝা যায় কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর কওলি ও ফেয়লি সুন্নাহ হচ্ছে ভাব প্রকাশ করে পড়া বা আবৃত্তি করা।

তথ্য-৩

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاَصْوَاتِهَا وَاِيَّاكُمْ لَحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنِ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَ سَيَجِيْءُ بَعْدِىْ قَوْمٌ يُّرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَقْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُم شَأْنُهُمْ. (رواه البيهقى في شعب الايمان و رزين في كتابه)

অর্থ: হযরত হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন: কুরআন পড় আরবদের সুর ও স্বরে এবং দূরে থাক আহলে কিতাব ও আহলে এশকদের সুর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং তাদের অন্তরও, যারা তাদের পদ্ধতিকে পছন্দ করবে। (বায়হাকী, রজীন)

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে রাসূল (সা.) প্রথমে কুরআন কী পদ্ধতিতে পড়তে হবে এবং পরে কী পদ্ধতি বর্জন করতে হবে তা উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (সা.) প্রথমে কুরআনকে আরবদের সুর ও স্বরে পড়তে বলেছেন। লক্ষণীয় হচ্ছে, সুর ও স্বর শব্দ দুটো রাসূল (সা.) এখানে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। স্বর বলতে সাধারণত উচ্চারণ বুঝায়। তাই স্বর বলতে তিনি এখানে উচ্চারণ বুঝিয়েছেন, এটা ধরাই স্বাভাবিক হবে। তাহলে রাসূল (সা.) এ হাদীসটির প্রথমে বলেছেন আরবরা যে সুর ও উচ্চারণে (তাজবীদের নিয়মে উচ্চারণ) কুরআন পড়ে সেই সুর ও উচ্চারণে কুরআন পড়তে।

এরপর তিনি কোন্ সুরে কুরআন পড়া নিষেধ তা বলে দিয়েছেন। সে সুর হচ্ছে আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের সুর। আহলে এশকদের পড়ার পদ্ধতিতে, পঠিত বিষয়ের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে

সুরকে বক্তব্য বিষয় থেকে বেশি বা সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। হাদীসটির এ অংশে রাসূল (সা.) তাহলে নিষেধ করেছেন কুরআনকে এমন পদ্ধতিতে পড়তে যেখানে সুর বক্তব্য বিষয়ের থেকে বেশি বা সমান গুরুত্ব পায়।

পরে রাসূল (সা.) বলেছেন, তাঁর এন্তেকালের পর শীঘ্রই এমন লোকদের উদ্ভব হবে যাদের কুরআন পড়ার পদ্ধতি হবে এমন যেখানে কুরআনের অর্থ বা বক্তব্য বুঝা থেকে সুর দেয়ার গুরুত্ব হবে অনেক অনেক বেশি। অর্থাৎ তাদের কুরআন পড়ার পদ্ধতি হবে গান গাওয়ার পদ্ধতির মত। কারণ, গান গাওয়ার পদ্ধতিতে সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয় বুঝার গুরুত্ব থেকে বেশি বা সমান হয়। এ কথাটি রাসূল (সা.) প্রকাশ করেছেন হাদীসটির 'যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না' অংশটুকুর মাধ্যমে।

হাদীসটির শেষ অংশে রাসূল (সা.), যারা কুরআনকে গান ও বিলাপের সুরে পড়বে কিন্তু কুরআনের বক্তব্য বুঝবে না এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে, তারা কেমন লোক তা বলে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন–তারা হচ্ছে দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত লোক। অর্থাৎ তারা গুনাহগার।

আহলে এশকদের পড়ার পদ্ধতি এবং গান গাওয়ার পদ্ধতি একই। কারণ উভয় পদ্ধতিতে সুরকে বক্তব্য বিষয় বুঝার তুলনায় বেশি বা সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই রাসূল (সা.)-এর আহলে এশকদের পদ্ধতি অনুসরণ করতে নিষেধ করা আর গানের পদ্ধতি অনুসরণকারীদের দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত লোক বলা কথা দুটি সম্পূরক কথা।

হাদীসটি থেকে তাহলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) কুরআনকে গানের সুরে পড়তে অর্থাৎ যে পড়ায় ভাব প্রকাশ হয় না এবং বক্তব্য থেকে সুরের গুরুত্ব বেশি বা সমান থাকে, তেমনভাবে পড়তে নিষেধ করেছেন। অন্য কথায় বলা যায়, রাসূল (সা.) এখানে কুরআনকে ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে বলেছেন।

তথ্য–৪

ক.

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) : مَا اَذِنَ اللهُ لِشَىْءٍ مَّا اَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُبِهِ. (متفق عليه)

অর্থঃ সেই হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ কোন জিনিসকে অত পছন্দ করেন না, যত পছন্দ করেন কোন নবীর উত্তম স্বরে শব্দ করে কুরআন পড়াকে। (বুখারী, মুসলিম)

খ.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا.

(رواه الدارمى)

অর্থঃ হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : তোমাদের স্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা উত্তম স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (দারেমী)

সম্মিলিত ব্যাখ্যাঃ হাদীস দু'টিতে রাসূল (সা.) উত্তম স্বর কথাটা ব্যবহার করেছেন। উত্তম সুর বলেননি। তিন নাম্বার তথ্যের হাদীসটিতে আমরা দেখেছি, সেখানে রাসূল (সা.) স্বর ও সুর শব্দ দুটো আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। তাই সহজেই বুঝা যায়, স্বর শব্দটার সাধারণ যে অর্থ হয়, রাসূল (সা.) ও ঐ শব্দটি দ্বারা তাই বুঝিয়েছেন। সে অর্থ হচ্ছে 'উচ্চারণ' অর্থাৎ তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী উচ্চারণ।

তাহলে হাদীস দুটোতে রাসূল (সা.) কুরআনকে উত্তম উচ্চারণে পড়তে বলেছেন। কোন গ্রন্থ পড়ার সময় উত্তম উচ্চারণ হবে সেই উচ্চারণ যেখানে অক্ষরের সঠিক উচ্চারণের সাথে সঠিক ভাব প্রকাশ করা হবে। অক্ষর উচ্চারণের সাথে সঠিক ভাব প্রকাশ করা না হলে সেটা কখনোই উত্তম উচ্চারণ হতে পারে না। সুতরাং এ হাদীস দুটো থেকেও বুঝা যায়, কুরআনকে সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়তে হবে অর্থাৎ আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

খ নং হাদীসটিতে রাসূল (সা.) বলেছেন, উত্তম স্বরে কুরআন পড়া কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। অর্থাৎ আবৃত্তি করে কুরআন পড়া কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। তাহলে এখান থেকে সহজে বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য হচ্ছে ভাব প্রকাশ করে কুরআন না পড়া অর্থাৎ কুরআনকে আবৃত্তি না করার অর্থ হচ্ছে কুরআনকে অসৌন্দর্যমণ্ডিত বা অপমানিত করা।

তথ্য—৫

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْآنِ وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ قَالَ طَاوُسٌ وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِكَ. (رواه الدارمى)

অর্থঃ তাবেয়ী হযরত তাউস মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করা হল, কুরআনে স্বর প্রয়োগ ও উত্তম তেলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, যার কুরআন পাঠ শুনে মনে হয় সে যেন আল্লাহর ভয়ে ভীত হচ্ছে। তাউস বলেন, তাবেয়ী তাল্‌ক এরূপই ছিলেন অর্থাৎ তাবেয়ী তালকের কুরআন পাঠ ঐ রকমই ছিল। (দারেমী)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি থেকে সহজেই বুঝা যায়, রাসূল (সা.) কুরআনের সেই ধরনের স্বর প্রয়োগ (অর্থাৎ সেই ধরনের উচ্চারণ) এবং সেই ধরনের তেলাওয়াতকারীকে উত্তম বলেছেন যার স্বর প্রয়োগ (উচ্চারণ) শুনলে বুঝা যায় যে, সে (তেলাওয়াতকারী) আল্লাহর ভয়ে ভীত হচ্ছে। কারো তেলাওয়াত শুনে তেলাওয়াতকারী আল্লাহর ভয়ে ভীত হচ্ছে কিনা তা তখনই শুধু বুঝা যায়, যখন তেলাওয়াতকারী ভাব প্রকাশ করে তেলাওয়াত করেন। অর্থাৎ আবৃত্তি করে পড়েন। তাহলে এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়, করআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

হাদীসটির বক্তব্য কুরআনের এ বিষয়ে বিশেষ করে কুরআনের ৭ নং তথ্যের (পৃষ্ঠা নং ৩০) বক্তব্যের সঙ্গে এবং পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। তাই হাদীসটি মুরসাল হলেও শক্তিশালী।

তথ্য—৬

ক.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. (متفق عليه)

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কান পেতে শুনেন না কোনো কথাকে, যত না কান পেতে শুনেন কোনো নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। (বুখারী ও মুসলিম)

খ.

وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص): لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

(رواه البخارى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: সে আমাদের দলের নয় যে সুর করে কুরআন পড়ে না। (বুখারী)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: প্রধানত এ দুটো সহীহ হাদীসের ব্যাখ্যা থেকেই বর্তমান মুসলিম বিশ্বে কুরআন একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়ার পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং তা প্রায় সকল মুসলমান অনুসরণ করছে। তাই হাদীস দুটোর বক্তব্য থেকে কুরআন পড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে কী কী তথ্য পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে কোনটি ইসলামে গ্রাহণযোগ্য এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার।

হাদীস দুটো থেকে সহজে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) করআনকে সুর করে পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সুর করে পড়ার দুটো অর্থ হতে পারে। যথা-

১. ভাব প্রকাশ না করে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া এবং

২. যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে পড়া তথা আবৃত্তির সুরে পড়া।

তাহলে এ হাদীস দুটোতে মহান আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) কুরআনকে সুর করে পড়তে বলে উপরের দুটো পদ্ধতির মধ্যে কোনটা বুঝিয়েছেন সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা, পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চলুন এখন বিষয়টা পর্যালোচনা করা যাক-

১. 'ভাব প্রকাশ না করে সুর করে পড়া অর্থাৎ গানের সুরে পড়া'

আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যাটি-

- ❑ একই ব্যাপারে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের সকল তথ্যের বিরুদ্ধ,
- ❑ পূর্বোল্লিখিত সকল হাদীসের তথ্যের বিরুদ্ধ। ঐ হাদীসগুলোর মধ্যে ২ নং তথ্যের হাদীস দুটো আলোচ্য হাদীস দুটো থেকে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী,
- ❑ পূর্বে আলোচনাকৃত বিবেক-বুদ্ধির সকল তথ্যেরও বিরুদ্ধ।

❷❷ তাহলে কুরআন, অন্যান্য হাদীস ও বিবেক বুদ্ধির তথ্য পর্যালোচনা করে সহজেই বলা যায়, আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যা কখনই ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২. 'যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া'

আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যাটি-

- ❑ পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআনের সকল তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিশীল,
- ❑ পূর্বোল্লিখিত সকল হাদীসের তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিশীল,
- ❑ বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গেও সঙ্গতিশীল।

❷❷ তাই আলোচ্য হাদীস দুটোর এ ব্যাখ্যাটা ইসলামী জীবন বিধানে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

তথ্য-৭

وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ وَ يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ وَ يَمُدُّ بِالرَّحْمَانِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ.(بخارى)

অর্থ: তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূল (সা.)-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিল? তিনি বললেন, 'সেখানে মদ (টান) ছিল'। অতঃপর আনাস (রা.) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন (এবং) টানলেন বিসমিল্লাহতে, রহমানে এবং রাহীমে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: হাদীসটি এবং অন্য আরো কিছু হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) কুরআন পড়ার সময় মদ্দের অক্ষরের বা চিহ্নের স্থানে টেনে পড়তেন। কিন্তু সেই টানের সময়ের একক (Unit) কী হবে, তা তিনি কখনও বলেননি। তাই মুসলিম বিশ্বে টানের এককের নাম 'আলিফ' বলে চালু থাকলেও সেই 'আলিফ' বলতে ১ সেকেন্ড, ২ সেকেন্ড, ৫ সেকেন্ড, না ১ মিনিট বুঝাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই কুরআন তেলাওয়াতে টান দেয়ার সময় টানের একক হিসেবে যার যা ইচ্ছা ধরতে পারে কিন্তু টানের পরিমাণ বাড়ানোর সময় ঐ এককের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি এক আলিফকে ১ সেকেন্ড ধরে তবে তিন আলিফ টানের স্থানে তাকে ৩ সেসেন্ড টানতে হবে। আবার কেউ যদি এক আলিফকে ৫ সেকেন্ড ধরে তবে তিন আলিফ টানের স্থানে তাকে ১৫ সেকেন্ড টানতে হবে।

আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত তথ্য

সুধী পাঠক, এ পর্যায়ে এসে তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারা যায় যে, আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে, পূর্বোল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির সকল তথ্য পর্যালোচনার পর যে চূড়ান্ত তথ্যসমূহ পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

১. কুরআনকে ভাব প্রকাশ না করে পড়তে অর্থাৎ গানের সুরে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

২. কুরআনকে ভাব প্রকাশ করে সুর করে পড়তে অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়তে বলা হয়েছে।

৩. কুরআন পড়ার সময় টানের স্থানে টান দিতে হবে কিন্তু সে টানের পরিমাণের একক যার যা ইচ্ছা, ধরা যাবে।

কুরআনকে আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতি চালু হলে যে সকল কল্যাণ হবে

চলুন এখন বর্তমান জাতি যদি কুরআনকে একই ভঙ্গিতে সুর করে বড়া ছেড়ে দিয়ে আবৃত্তির সুরে পড়া আরম্ভ করে, তবে যে কল্যাণগুলো হবে তা পর্যালোচনা করা যাক। সে কল্যাণগুলো হচ্ছে-

১. ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে, মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। আর এ কাজে কৃতকার্য হওয়ার জন্যে মুসলমানরা কুরআন না পড়ুক, এটা চাওয়া থেকে শয়তান বেশি চায় মুসলমানদের কুরআন পড়ার পদ্ধতি এমন হোক যাতে অর্থ না বুঝেও তা অনুসরণ করা যায়। কারণ তাতে যে পড়ছে সে খুশি থাকবে কিন্তু সে কুরআনের জ্ঞানী হবে না। একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার পদ্ধতিটি হচ্ছে এমন যে, অর্থ না বুঝলেও তা অনুসরণ করা যায়। কিন্তু আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতিটি অর্থ না বুঝলে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

২. কুরআন পড়ার সময় যিনি পড়বেন এবং যিনি শুনবেন উভয়েই ঈমান বেড়ে যাবে।

৩. সমাজে কুরআনের জ্ঞানী লোক অনেক বেড়ে যাবে। ঐ লোকদের, যে কথা কুরআন বিরুদ্ধ সে কথাকে ইসলামের কথা বা যে কথা কুরআনে

নেই, তাকে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক কথা বলে আর গিলানো যাবে না। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়’ নামক বইটিতে। আর ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো জানতে ও বুঝতে পারলে অনেক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার লোকও খাঁটি মুসলমান হয়ে যাবে।

আল কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া সিদ্ধ হবে কিনা

বর্তমানে আল-কুরআনে যতি চিহ্ন (ভাব প্রকাশের চিহ্ন) নাই। আল-কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া উচিত বা বৈধ হবে কিনা, সে ব্যাপারে কিছু আলোচনা না করলে লেখাটি অপরিপূর্ণ রয়ে যাবে। বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে হলে প্রথমে আল-কুরআন সংকলনের ইতিহাসটি জানা দরকার।

কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (স.)-এর কাতেবগণ (লেখকগণ) তা খেজুর পাতা, হাড়, পাথর খণ্ড, চামড়া ইত্যাদির ওপর লিখে নিতেন এবং সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে নিতেন। এভাবে রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় পুরো কুরআন বিচ্ছিন্নভাবে লিখে রাখা হয়েছিলো এবং তা মুখস্থও করে রাখা ছিলো।

রাসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকটি যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফিজ শহীদ হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) প্রথমে চিন্তা করেন যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্যে শুধুমাত্র হাফিজদের উপর নির্ভর করে না থেকে তা সংকলিত আকারে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকাও দরকার। বিষয়টি তিনি তদানীন্তন খলিফা হজরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থাপন করলে চিন্তা-ভাবনা করে তিনিও এ বিষয়ে সম্মত হন এবং রাসূল (স.)-এর কাতেব যায়েদ (রা.)কে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেন। যায়েদ (রা.) কুরআনের লিখে রাখা বিচ্ছিন্ন অংশ, হাফিজ সাহাবীদের মুখস্থ করে রাখা কুরআন এবং অন্য সাহাবীদের মুখস্থ থাকা কুরআনের অংশের সাহায্য নিয়ে, নির্ভুলতার ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত হয়ে, একখণ্ড পুরো কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। সে কুরআনখানি হজরত হাফসা (রা.)-এর দায়িত্বে রেখে দেয়া হয়।

কুরাইশরা যে আরবীতে কথা বলত কুরআন নাযিল হয় সেই আরবীতে এবং হযরত যায়েদ (রা.) যে কুরআনটি প্রথম লিখেন, সেটাও কুরাইশী আরবীতে লেখা হয়। কিন্তু রাসূল (স.)-এর সময় থেকে কুরআনকে কয়েকটি আঞ্চলিক আরবী ভাষায় পড়ার অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক আরবী উচ্চারণে পড়ার জন্য কুরআন কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে পরামর্শ করে হযরত উসমান (রা.) নির্দেশ দেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় কুরাইশী আরবীতে লেখা প্রথম কুরআনটির অনুরূপ ছাড়া অন্য সকল উচ্চারণ ও বাকরীতিতে লেখা কুরআন প্রকাশ ও পাঠ করা নিষিদ্ধ এবং হযরত উসমান (রা.) ঐ প্রথম কুরআনটির অনুলিপি করে সকল স্থানে পাঠিয়ে দেন। ওই কুরআনের অনুলিপিই আজ সারা বিশ্বে উপস্থিত।

প্রথমে কুরআনে কোন হরকত অর্থাৎ নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি ছিল না। আরব ভাষাভাষীদের তাতে কুরআন পড়তে অসুবিধা হত না। কিন্তু অনারব মুসলমানদের হরকত না থাকায় কুরআন পড়তে অসুবিধা হতে থাকে এবং এ কারণে ভুল পড়ার জন্যে আবার কুরআনের অর্থের কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর তাই কুরআনে হরকত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন বসরার (ইরাক) গভর্নর জিয়াদ, যিনি ৪৫ থেকে ৫৬ হিজরী পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের আমলে (৬৫-৮৬ হিজরী) ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ঐ হরকত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং বর্তমানে সকল কুরআন ঐ হরকত দিয়েই লেখা হয়।

কুরআন সংকলনের এই ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাসূল (স.)-এর যুগে না থাকা সত্ত্বেও জাতির কল্যাণের কথা খেয়াল করে অর্থাৎ অনারবদের উচ্চারণের ভুলের জন্যে কুরআনের অর্থের পরিবর্তন রোধের জন্যে, আল-কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে এবং জাতি তা বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে।

পূর্বে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের মাধ্যমে আমরা জেনেছি, কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের রায় অনুযায়ী কুরআনকে পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশসহ

সুর করে অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে। আর এভাবে কুরআন পড়তে হবে সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া ও যথাযথভাবে মনের ভাবের পরিবর্তন হওয়ার জন্যে। অনারব মুসলমানদের যথাযথ ভাব প্রকাশ করে কুরআন পড়া অনেক সহজ হবে যদি প্রতিটি আয়াতের শেষে যথাযথ ভাব প্রকাশকারী যতি চিহ্ন দেয়া হয়। তাই কুরআনে হরকত দেয়ার কাজটির ন্যায়, জাতির প্রভূত কল্যাণের জন্যেই ভবিষ্যতে কুরআনে প্রতিটি আয়াতের শেষে যথাযথ যতি চিহ্ন দেয়া বিশেষভাবে জরুরি বলে আমি মনে করি।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে নিজস্ব কোন মত আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই। আর ইসলামের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মত অবস্থানেও আমি নই। আমি শুধু চেষ্টা করেছি, আলোচ্য বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির যে তথ্যগুলো, অনুসন্ধানের সময় আমার সামনে এসেছে, তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে। আর এটা করতে প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি, পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর জাতির প্রতি দরদ আছে এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না, এমন সকল বিবেকবান পাঠকের পক্ষে কুরআন কোন্ পদ্ধতিতে পড়তে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা তেমন কঠিন হবে না।

আর যারা ইসলামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন, তাদের নিকট আমার আকুল আবেদন, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে, দুর্ভাগা মুসলিম জাতিকে আলোচ্য বিষয়ে নতুন করে দিক-নির্দেশনা দেয়া যায় কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে। কারণ, পরকালে আমার থেকে তাদেরকেই মহান আল্লাহর নিকট বেশি জবাবদিহি করতে হবে বলে আমার মনে হয়।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার বা সঠিক তথ্যকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক ও মনোবল দান করুন। আমিন, সুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

বের হয়েছে –

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক , বুদ্ধি অনুযায়ী –

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (স.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোন্‌গুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি – মানুষ রচিত আইন না কুরআনের আইন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন, নেককার মু'মিন, ফাসিক ও কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?

লেখকের নিম্নোক্ত বইগুলো বের হওয়ার অপেক্ষায় –

⑥ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি আনুযায়ী –

১. সঠিক স্থানে ভোট দেয়া কত বড় সওয়াব এবং ভোট না দেয়া বা ভুল স্থানে দেয়া কত বড় গুনাহ
২. অমুসলিম সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি?

প্রাপ্তিস্থান

o আধুনিক প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার,
ফোন: ৯৩৩৯৪৪২

⑥ ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭

⑥ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫

⑥ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮

⑥ তাসনিয়া বই বিতান, ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১২-০৪৩৫৪০

⑥ ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন : ৮৬২৫০৯৭

⑥ মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬

⑥ এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে